ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব: আল-ফিকহ বিভাগ

ফিকহ ৪র্থ পত্র: আল কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ (পত্র কোড-৬৩১১০৪)

খ-বিভাগ: উসুলুল কারখী (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

مجموعة (ج) أجب عن أربعة فقط

১. **ما هو الاسم الكامل للإمام أبي الحسن الكرخي، ومتى كانت وفاته؟** [ইমাম আবুল হাসান আল-কারখীর পূর্ণ নাম কী, এবং তাঁর মৃত্যু কখন হয়েছিল?]
২. **ما هي مكانة الكرخي العلمية بين فقهاء الحنفية، وبماذا اشتهر؟** [হানাফী ফকীহদের মধ্যে কারখীর ইলমী অবস্থান কী, এবং তিনি কীসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন?]
৩. **ما هي طريقة الإمام الكرخي في تأليف كتاب "الأصول" (هل هي طريقة الفقهاء أم المتكلمين)؟** [ইমাম কারখী তাঁর 'উসুল' কিতাবটি রচনায় কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন (ফকীহদের পদ্ধতি নাকি মুতাকাল্লিমীনের পদ্ধতি)?]
৪. **اذكر موضوع كتاب "أصول الكرخي" باختصار.** ['উসুলুল কারখী' কিতাবের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উল্লেখ কর।]
৫. **ما هي أول قاعدة أصولية بدأ بها الكرخي كتابه؟** [কারখী তাঁর কিতাবে প্রথম যে উসূলী কায়দা দিয়ে শুরু করেছেন, তা কী?]
৬. **ما هو حكم الفرض والواجب عند الحنفية؟ وهل هناك اختلاف في الأصول؟** [হানাফীদের নিকট ফরজ ও ওয়াজিবের বিধান কী? এবং উসুলে কি কোনো পার্থক্য আছে?]
৭. **متى يكون الأمر (صيغة الأمر) يفيد الوجوب في أصول الحنفية؟** [হানাফী উসুলে কখন আদেশ (صيغة الأمر) দ্বারা ওয়াজিব বোঝায়?]
৮. **متى يحمل النهي (صيغة النهي) على التحريم في المذهب الحنفي؟** [হানাফী মাযহাবে কখন নিষেধ (صيغة النهي) দ্বারা হারাম বোঝায়?]
৯. **بين العلاقة بين العام والخاص في استنباط الأحكام عند الكرخي.** [কারখীর মতে বিধান উদ্ভাবনে আম (العام) ও খাস (الخاص)-এর মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্ট কর।]
১০. **ما هو المراد من قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة"؟** ["আল আসলু ফিল আশয়াই আল-ইবাহা" (বস্তুসমূহে মূল হলো বৈধতা) কায়দাটির উদ্দেশ্য কী?]

১১. **ما هي حجة العمل بـ الاستحسان في المذهب الحنفي؟** [হানাফী মাযহাবে ইসতিহসান (পছন্দনীয় বিধান)-এর উপর আমল করার প্রমাণ কী?]
১২. **متى يعتبر الظاهر (ظاهر النص) حجة عند الكرخي؟** [কারখীর মতে কখন প্রকাশ্য অর্থ (জাহিরুন নাস) দলিল হিসেবে গণ্য হয়?]
১৩. **بين قاعدة الكرخي في تقديم الخاص على العام.** [খাসকে আমের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কারখীর কায়দাটি কী, তা সুস্পষ্ট কর।]
১৪. **متى يكون العرف والعادة حجة في الأحكام عند الكرخي؟** [কারখীর মতে কখন প্রথা (উরফ) বিধানের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গণ্য হয়?]
১৫. **ما هي قاعدة الكرخي حول البيان بالسكوت؟** [নীরবতা দ্বারা ব্যাখ্যার (আল-বায়ান বিস-সুকুত) বিষয়ে কারখীর কায়দাটি কী?]
১৬. **ما هو تعريف "النسخ" في أصول الفقه؟** [উসুলুল ফিকহে "নাসখ" (রহিতকরণ)-এর সংজ্ঞা কী?]
১৭. **هل يجوز نسخ الكتاب بـ خبر الواحد؟ وما هي قاعدة الكرخي في ذلك؟** [খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কিতাবকে নাসখ করা কি বৈধ? এবং এ বিষয়ে কারখীর কায়দা কী?]
১৮. **بين قاعدة الكرخي حول تعارض القياسين.** [দুটি কিয়াসের বিরোধের বিষয়ে কারখীর কায়দাটি কী, তা সুস্পষ্ট কর।]
১৯. **اذكر قاعدة "دخول البعض في الكل" عند الكرخي.** [কারখীর মতে "দুখুলুল বা'দ ফিল কুল" 'অংশকে সমগ্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা' কায়দাটি উল্লেখ কর।]
২০. **بين قاعدة "الاحتياط في العبادات" في مذهب الكرخي.** [কারখীর মাযহাবে "আল-ইহতিয়াতু ফিল ইবাদাত" (ইবাদতে সতর্কতা) কায়দাটি কী, তা সুস্পষ্ট কর।]
২১. **ما هو دور سد الذرائع في أصول الكرخي؟** [কারখীর উসুলে সাদ্দে যারাই (অনিষ্টের পথ বন্ধ করা)-এর ভূমিকা কী?]
২২. **كيف يفرق الكرخي بين العقد الصحيح والعقد الباطل؟** [কারখী সহীহ চুক্তি এবং বাতিল চুক্তির মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করেন?]
২৩. **بين قاعدة الكرخي حول البيان بالاستثناء.** [ব্যতিক্রম দ্বারা ব্যাখ্যার (আল-বায়ান বিল ইসতিছনা) বিষয়ে কারখীর কায়দাটি কী, তা সুস্পষ্ট কর।]

২৪. **ما هو حكم الخبر الواحد في إثبات أحكام الحدود (العقوبات المحددة)؟** [হুদুদের (নির্ধারিত শাস্তি) বিধান প্রমাণে খবরে ওয়াহেদ (একজনের বর্ণনা)-এর বিধান কী?]
২৫. **ما هي قاعدة الكرخي في تقديم قول الصحابي على القياس؟** [কিয়াসের উপর সাহাবীর উক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কারখীর কায়দাটি কী?]
২৬. **ما هي قاعدة الكرخي فيما يتعلق بـ المصلحة المرسلة؟** [মাসলাহা মুরসালা (যার পক্ষে কোনো স্পষ্ট দলিল নেই)-এর বিষয়ে কারখীর কায়দাটি কী?]

প্রশ্ন ১: ইমাম আবুল হাসান আল-কারখীর পূর্ণ নাম কী, এবং তাঁর মৃত্যু কখন হয়েছিল?
(ما هو الاسم الكامل للإمام أبي الحسن الكرخي، ومتى كانت وفاته؟)

উত্তর:

ভূমিকা:
হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর হানাফি মাজহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও উসুলবিদ হলেন ইমাম কারখী (রহ.)। তিনি ছিলেন ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যার মাধ্যমে ইরাকে হানাফি মাজহাবের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে।

নাম ও পরিচিতি (الاسم والتعريف):
তাঁর নাম, উপনাম ও বংশপরম্পরা নিম্নরূপ:

- **নাম (الاسم):** উবায়দুল্লাহ (عبيد الله)।
- **উপনাম (الكنية):** আবুল হাসান (أبو الحسن)।
- **বাবার নাম:** আল-হুসাইন ইবনে দাল্লাল।
- **নিসবাহ বা উপাধি (النسبة):** আল-কারখী (الكرخي)। বাগদাদের 'কারখ' নামক মহল্লায় বসবাস করার কারণে তাঁকে কারখী বলা হয়।

পুরো নাম: **উবায়দুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবনে দাল্লাল ইবনে দলহাম আল-কারখী।**

জন্ম (المولد):
তিনি ২৬০ হিজরি সনে (মতান্তরে ২৬২ হি.) জন্মগ্রহণ করেন। ইলম অন্বেষণের জন্য তিনি তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞানকেন্দ্রে ভ্রমণ করেন।

মৃত্যু (الوفاة):
এই মহান মনীষী হিজরি ৩৪০ সনের শাবান মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইন্তেকাল করেন।

আরবিতে বলা হয়:

"تُوُفِّيَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ"

(অর্থ: তিনি ৩৪০ হিজরি সনের মধ্য শাবানের রজনীতে ইন্তেকাল করেন।)

উপসংহার:
ইমাম কারখী (রহ.) ৮০ বছরের দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর জীবনকে ইলমে দ্বীনের খেদমতে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাগদাদে হানাফি মাজহাবের নেতৃত্বের ভার তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ওপর অর্পিত হয়।

প্রশ্ন ২: হানাফী ফকীহদের মধ্যে কারখীর ইলমী অবস্থান কী, এবং তিনি কীসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন?
(ما هي مكانة الكرخي العلمية بين فقهاء الحنفية، وبماذا اشتهر؟)

উত্তর:

ভূমিকা:
ইমাম আবুল হাসান আল-কারখী (রহ.) হানাফি ফিকহের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের 'রইসুল হানাফিয়্যাহ' বা হানাফিদের প্রধান নেতা।

ইলমী অবস্থান (المكانة العلمية):
হানাফি ফকীহদের শ্রেণিবিভাগে বা 'তাবাকাত'-এর দিক থেকে তিনি ছিলেন 'আসহাবুত তাখরিজ' (أصحاب التخريج)-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, তিনি এমন একজন মুজতাহিদ ছিলেন, যিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর সাথিদের নির্ধারিত উসুল বা মূলনীতির আলোকে নতুন নতুন মাসআলা সমাধান করতে সক্ষম ছিলেন।

আল্লামা ইবনে কামাল পাশা (রহ.)-এর মতে:
"هُوَ مِنْ طَبَقَةِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْمَسَائِلِ الَّذِينَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الِاجْتِهَادِ فِي الْأُصُولِ، لَكِنَّهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ"

(অর্থ: তিনি মাসআলার ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের স্তরের অন্তর্ভুক্ত, যারা উসুলের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করেন না বটে, তবে উসুলের আলোকে বিধান বের করতে সক্ষম।)

যেসব কারণে তিনি বিখ্যাত (بماذا اشتهر):
তিনি মূলত তিনটি কারণে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন:

১. জুহদ ও তাকওয়া (الزهد والتقوى): তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ ও অতিশয় পরহেজগার। রাষ্ট্রীয় ভাতা বা উপহার গ্রহণ করা থেকে তিনি বিরত থাকতেন। তাঁর দারিদ্র্য ও ধৈর্যের ঘটনাগুলো ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

২. হানাফি মাজহাবের সংরক্ষণ: ইমাম তাহাবী (রহ.)-এর পর ইরাকে হানাফি মাজহাবের প্রচার ও সংরক্ষণে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনি বহু জটিল মাসআলার সমাধান দিয়েছেন।

৩. উসুলের কিতাব রচনা: তাঁর রচিত 'রিসালা ফিল উসুল' (যা 'উসুলুল কারখী' নামে পরিচিত) হানাফি উসুলের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। এটি হানাফিদের মূলনীতিগুলো সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

উপসংহার:
ইমাম কারখী (রহ.) কেবল একজন ফকিহ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের আধ্যাত্মিক ও ইলমী রাহবার। তাঁর ইলমী গভীরতা ও চারিত্রিক মাধুর্য তাঁকে হানাফি মাশায়েখদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় মাকামে আসীন করেছে।

প্রশ্ন ৩: ইমাম কারখী তাঁর 'উসুল' কিতাবটি রচনায় কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন (ফকীহদের পদ্ধতি নাকি মুতাকাল্লিমীনের পদ্ধতি)?
ما هي طريقة الإمام الكرخي في تأليف كتاب "الأصول" (هل هي طريقة الفقهاء أم المتكلمين)؟

উত্তর:

ভূমিকা:
উসুলুল ফিকহ রচনার ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি পদ্ধতি প্রচলিত: ১. তরিকাতুল মুতাকাল্লিমিন (শাফেয়ী পদ্ধতি) এবং ২. তরিকাতুল ফুকাহা (হানাফি পদ্ধতি)। ইমাম কারখী (রহ.) তাঁর কিতাব রচনায় হানাফি ফকিহদের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

ইমাম কারখীর অনুসৃত পদ্ধতি (طريقة الفقهاء):

ইমাম কারখী (রহ.) তাঁর 'উসুল' গ্রন্থে 'তরিকাতুল ফুকাহা' (طريقة الفقهاء) অনুসরণ করেছেন। এই পদ্ধতির মূল কথা হলো—আগে ফিকহী মাসআলা বা 'ফুরু' (الفروع) থেকে উসুল বা মূলনীতি (الأصول) বের করা।

উসুলবিদগণের ভাষায় এই পদ্ধতিটি হলো:
"تَخْرِيجُ الْأُصُولِ عَلَى الْفُرُوعِ"

(অর্থ: ফুরু বা শাখা মাসআলার ওপর ভিত্তি করে উসুল বা মূলনীতি উদ্ভাবন করা।)

পদ্ধতির বিশ্লেষণ:
মুতাকাল্লিমিনগণ (যেমন ইমাম শাফেয়ী রহ.) আগে বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে উসুল ঠিক করেন এবং পরে ফিকহ মেলান। কিন্তু ইমাম কারখী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর ফতোয়া ও মাসআলাগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সেখান থেকে সাধারণ নীতিমালা বা 'কাওয়ায়েদ' বের করেছেন।

এজন্য তাঁর কিতাবে দেখা যায়, তিনি প্রতিটি উসুলের সাথে ফিকহী উদাহরণ যুক্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন:

"الْأَصْلُ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِالْيَقِينِ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ"

(অর্থ: মূলনীতি হলো—যা নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, তা সন্দেহের দ্বারা দূর হয় না।)

এই নীতিটি তিনি পবিত্রতা ও সালাতের বিভিন্ন ফিকহী মাসআলা থেকে চয়ন করেছেন।

কেন তিনি এই পদ্ধতি বেছে নিলেন?
ইমাম কারখী (রহ.) যেহেতু হানাফি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মাজহাবের ইমামদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিক ভিত্তি দাঁড় করানো, তাই 'তরিকাতুল ফুকাহা' ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এতে ফিকহ ও উসুলের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

উপসংহার:
ইমাম কারখীর এই পদ্ধতি হানাফি মাজহাবের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এর মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে, ইমাম আজম (রহ.) কোন মূলনীতির ওপর ভিত্তি

করে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তাই 'উসুলুল কারখী' ফুকাহাদের পদ্ধতিতে রচিত একটি অনন্য গ্রন্থ।

প্রশ্ন ৪: 'উসুলুল কারখী' কিতাবের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
(اذكر موضوع كتاب "أصول الكرخي" باختصار)

উত্তর:

ভূমিকা:
হানাফি ফিকহের ইতিহাসে 'উসুলুল কারখী' একটি মৌলিক ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। ইমাম আবুল হাসান আল-কারখী (রহ.) এতে এমন কিছু সারগর্ভ নীতিমালা একত্রিত করেছেন, যা ফিকহী মাসআলা অনুধাবনে চাবিকাঠির ভূমিকা পালন করে।

কিতাবের বিষয়বস্তু (موضوع الكتاب):
এই কিতাবের মূল আলোচ্য বিষয় হলো 'আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ' (القواعد الفقهية) বা ফিকহী মূলনীতি। ইমাম কারখী (রহ.) এখানে কোনো তাত্ত্বিক বা দার্শনিক উসুল আলোচনা করেননি। বরং তিনি হানাফি ফিকহের হাজারো শাখা-প্রশাখা (ফুরু) থেকে নির্যাস বের করে ৩৯টি (মতান্তরে ৩৭টি) মূলনীতি বা 'উসুল' সংকলন করেছেন।

বিষয়বস্তুর ধরণ:

কিতাবটিতে মূলত দুটি দিক প্রাধান্য পেয়েছে:

১. শরিয়তের দলিলের প্রয়োগ: কুরআন ও সুন্নাহর শব্দাবলী (যেমন—আম, খাস, হাকিকত, মাজাজ) কীভাবে বিধানের ওপর প্রয়োগ হবে, তার নীতিমালা।

২. হুকুম নির্ণয়ের পদ্ধতি: যখন দুটি দলিলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় বা কোনো বিষয়ে স্পষ্ট নস পাওয়া যায় না, তখন ফকিহ কীভাবে ইজতিহাদ করবেন—সে সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা।

উদাহরণস্বরূপ:
বইটিতে আলোচিত একটি মূল বিষয় হলো—সন্দেহের কারণে নিশ্চিত বিশ্বাস বাতিল হয় না।

আরবিতে: "الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ"

এই নীতির ওপর ভিত্তি করে পবিত্রতা, সালাত ও লেনদেনের শত শত মাসআলা সমাধান করা হয়।

উপসংহার:
সংক্ষেপে বলা যায়, 'উসুলুল কারখী'র বিষয়বস্তু হলো—ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর সাথিদের ফতোয়াগুলো বিশ্লেষণ করে বের করা সেই 'সার্বজনীন সূত্রাবলী', যা দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আগত নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

প্রশ্ন ৫: কারখী তাঁর কিতাবে প্রথম যে উসূলী কায়দা দিয়ে শুরু করেছেন, তা কী? (ما هي أول قاعدة أصولية بدأ بها الكرخي كتابه؟)

উত্তর:

ভূমিকা:
যেকোনো উসূল গ্রন্থের প্রারম্ভিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম কারখী (রহ.) তাঁর কিতাবটি এমন একটি শক্তিশালী মূলনীতি বা 'কায়েদা' দিয়ে শুরু করেছেন, যা শরিয়তের নস বা টেক্সট বোঝার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

প্রথম মূলনীতি (القاعدة الأولى):
ইমাম কারখী (রহ.) কিতাবের শুরুতেই বলেন:

"الْأَصْلُ أَنَّ الْكَلَامَ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ"

সরল অনুবাদ:
মূলনীতি হলো—যেকোনো বাক্য বা কালাম তার 'জাহির' বা প্রকাশ্য অর্থের ওপরই প্রয়োগ হবে, যতক্ষণ না তার বিপরীত কোনো দলিল পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (الشرح والتحليل):
এই নীতির অর্থ হলো, কুরআন বা হাদিসের কোনো শব্দ যখন আমরা শুনি, তখন অভিধান ও সাধারণ ব্যবহারে তার যে অর্থটি সাথে সাথে মনে আসে, সেটাই গ্রহণ করতে হবে। বিনা কারণে বা দুর্বল যুক্তিতে শব্দের রূপক অর্থ (মাজাজ) নেওয়া বা ব্যাখ্যা (তাবিল) করা জায়েজ নেই।

দালিলিক প্রয়োগ:

আল্লাহ তাআলা বলেন: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" (অর্থ: আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন)।

এখানে 'বাই' (বেচাকেনা) শব্দটি সাধারণ। কারখীর এই নীতি অনুসারে, এর প্রকাশ্য অর্থ হলো—যেকোনো প্রকার বেচাকেনাই হালাল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন হাদিসে বলা হয়েছে যে 'সুদী কারবার' বা 'ধোঁকাপূর্ণ বেচাকেনা' হারাম, তখন সেই নির্দিষ্ট দলিল (دليل خاص)-এর কারণে সাধারণ হুকুম থেকে ওগুলো বাদ যাবে। কিন্তু যতক্ষণ দলিল না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ প্রকাশ্য অর্থই বহাল থাকবে।

উপসংহার:

এই প্রথম নীতিটি মুজতাহিদদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটি শরিয়তের বিধানকে মানুষের মনগড়া ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করে এবং নস-এর প্রকাশ্য অর্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়।

প্রশ্ন ৬: হানাফীদের নিকট ফরজ ও ওয়াজিবের বিধান কী? এবং উসুলে কি কোনো পার্থক্য আছে?

(ما هو حكم الفرض والواجب عند الحنفية؟ وهل هناك اختلاف في الأصول؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

অন্যান্য মাজহাবে (যেমন শাফেয়ী) ফরজ ও ওয়াজিব সমার্থক হলেও হানাফি উসুলে এই দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য মূলত দলিলের শক্তির ওপর ভিত্তি করে করা হয়।

সংজ্ঞা ও পার্থক্য (التعريف والفرق):

১. ফরজ (الفرض):

যা অকাট্য দলিল (دليل قطعي) দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ, যার প্রমাণে কোনো প্রকার সন্দেহ বা সংশয় নেই। যেমন—কুরআনের স্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদিস।

- **উদাহরণ:** পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, যাকাত, হজ।

- **হুকুম:** ফরজ অস্বীকারকারী **কাফির** (কাফের)। আর বিনা ওজরে আমল বর্জনকারী ফাসিক ও কঠিন শাস্তির যোগ্য।

২. ওয়াজিব (الواجب):

যা প্রবল ধারণাপ্রসূত দলিল (دليل ظني) দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ, দলিলটি সহীহ হলেও তা অকাট্য বা মুতাওয়াতির পর্যায়ের নয় (যেমন—খবরে ওয়াহেদ)।

- **উদাহরণ:** বিতরের সালাত, দুই ঈদের সালাত, সদকায়ে ফিতর।
- **হুকুম:** ওয়াজিব অস্বীকারকারী কাফির নয়, তবে পথভ্রষ্ট বা বিদআতি হবে। আমলগতভাবে এটি ফরজের মতোই অপরিহার্য। অর্থাৎ, ওয়াজিব ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে, তবে ফরজের চেয়ে কিছুটা লঘু।

উসুলী পার্থক্য (الاختلاف في الأصول):

হানাফি উসুলে মূল পার্থক্যটি হলো 'ইতিকাদ' (বিশ্বাস) ও 'আমল' (কর্ম)-এর ক্ষেত্রে।

- আমলের ক্ষেত্রে ফরজ ও ওয়াজিব উভয়ই অপরিহার্য (لازم العمل)।
- কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ফরজের অস্বীকার কুফর, আর ওয়াজিবের অস্বীকার কুফর নয়।

ইমাম কারখী (রহ.) ও হানাফি উসুলবিদগণের মতে:

"الْفَرْضُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ لَا شُبْهَةَ فِيهِ، وَالْوَاجِبُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ"

(অর্থ: ফরজ হলো যা নিঃসন্দেহে অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, আর ওয়াজিব হলো যা সংশয়পূর্ণ (জন্নী) দলিল দ্বারা প্রমাণিত।)

উপসংহার:

ফরজ ও ওয়াজিবের এই বিভাজন হানাফি ফিকহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে শরিয়তের বিধানগুলোর গুরুত্বের স্তরবিন্যাস বোঝা সহজ হয় এবং কার ঈমান থাকবে আর কার থাকবে না—তা নির্ধারণ করা যায়।

প্রশ্ন ৭: হানাফী উসুলে কখন আদেশ (صيغة الأمر) দ্বারা ওয়াজিব বোঝায়? (متى يكون الأمر (صيغة الأمر) يفيد الوجوب في أصول الحنفية؟)

উত্তর:

ভূমিকা:
উসুলুল ফিকহের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো 'আমর' বা আদেশসূচক বাক্য। আল্লাহর নির্দেশগুলো পালন করা বান্দার জন্য অপরিহার্য কি না, তা মূলত এই 'আমর'-এর সিগাহ বা শব্দরূপর মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়।

আমরের বিধান (حكم الأمر):
হানাফী উসুলবিদগণের মতে, 'আমর' বা আদেশসূচক ক্রিয়া মূলত আবশ্যকতা বা 'উজুব' (الْوُجُوب)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। ইমাম কারখী (রহ.) ও অন্যান্য হানাফী ইমামগণের মূলনীতি হলো:

"مُطْلَقُ الْأَمْرِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ"

অর্থ: শর্তহীন সাধারণ আদেশ কোনো কাজকে ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়াকে দাবি করে।

কখন ওয়াজিব হবে:
যখন কোনো আদেশের সাথে এমন কোনো আলামত বা 'ক্বরিনা' (قرينة) থাকে না যা আদেশটিকে নফল বা মুস্তাহাবের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তখন তা সরাসরি ওয়াজিব হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ, আদেশটি যদি নিছক উপদেশের জন্য না হয় এবং এর বিপরীতে কোনো ছাড় না থাকে, তবে তা পালন করা বাধ্যতামূলক।

শর্তসমূহ:
১. আদেশটি সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

২. আদেশটি পালনের সামর্থ্য থাকতে হবে।

৩. আদেশটি রহিত (মানসুখ) হওয়া যাবে না।

উদাহরণ (المثال):

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন:

"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ"

(অর্থ: তোমরা নামাজ কায়েম কর।)

এখানে 'আক্বিমু' (কায়েম কর) শব্দটি 'আমর'-এর সিগাহ। এর সাথে এমন কোনো শব্দ নেই যা প্রমাণ করে যে নামাজ পড়া ঐচ্ছিক। তাই এই আদেশের কারণে নামাজ পড়া ফরজ বা ওয়াজিব।

ব্যতিক্রম:
যদি কোনো আদেশের সাথে ভিন্ন আলামত থাকে, তখন তা ওয়াজিব না হয়ে 'ইবাহাত' (বৈধতা) বোঝাতে পারে।

যেমন: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا" (তোমরা খাও এবং পান কর)। এটি আদেশের সিগাহ হলেও এখানে উদ্দেশ্য হলো খাওয়ার অনুমতি দেওয়া, সারাদিন খাওয়া ওয়াজিব করা নয়।

উপসংহার:
সুতরাং, হানাফী মাজহাবে 'সিগাতুল আমর' বা আদেশের শব্দ শুনলে ধরে নিতে হবে যে এটি পালন করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না এর বিপরীত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ৮: হানাফী মাযহাবে কখন নিষেধ (صيغة النهي) দ্বারা হারাম বোঝায়? (متى يحمل النهي (صيغة النهي) على التحريم في المذهب الحنفي؟)

উত্তর:

ভূমিকা:
শরিয়তে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশকে 'নাহি' (النهي) বা নিষেধ বলা হয়। হালাল ও হারামের সীমানা নির্ধারণে 'নাহি'-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

নাহির বিধান (حكم النهي):
হানাফী উসুল অনুযায়ী, নিষেধাজ্ঞার মূল দাবি হলো কাজটি বর্জন করা। ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, যখন শরিয়ত কোনো কাজ করতে নিষেধ করে, তখন তার স্বাভাবিক দাবি হলো কাজটি 'হারাম' বা নিষিদ্ধ হওয়া।

মূলনীতিটি হলো:

"مُطْلَقُ النَّهْيِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالْقُبْحَ"

অর্থ: সাধারণ বা শর্তহীন নিষেধ দাবি করে যে, কাজটি হারাম এবং মন্দ (কাবিল বা কদাকার)।

কখন হারাম হবে:

১. অকাট্য দলিল: যদি নিষেধাজ্ঞাটি কুরআনের আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদিস (অকাট্য দলিল) দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে তা সরাসরি 'হারাম' হবে।

২. প্রবল ধারণা: যদি নিষেধাজ্ঞাটি 'খবরে ওয়াহেদ' (একক বর্ণনাকারীর হাদিস) দ্বারা আসে এবং তাতে কঠোর ধমকি থাকে, তবে হানাফী মতে তা 'মাকরূহে তাহরিমি' হবে—যা হারামেরই নামান্তর বা হারামের কাছাকাছি।

উদাহরণ (المثال):

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

"وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا"

(অর্থ: তোমরা জিনার কাছেও যেও না।)

এখানে 'লা-তাকরাবু' (কাছে যেও না) হলো 'নাহি'-এর সিগাহ। যেহেতু এটি কুরআনের অকাট্য নির্দেশ এবং এর সাথে কোনো শিথিলতার ইঙ্গিত নেই, তাই জিনা করা বা এর কাছে যাওয়া সম্পূর্ণ হারাম।

পার্থক্য:

যদি নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হয় আদব শিক্ষা দেওয়া বা উত্তম পন্থার নির্দেশনা দেওয়া, তবে তা হারাম হবে না, বরং 'মাকরূহে তানজিহি' বা অপছন্দনীয় হবে। কিন্তু এর জন্য অবশ্যই আলাদা দলিলে প্রমাণ থাকতে হবে।

উপসংহার:

সারকথা হলো, হানাফী উসুলে 'নাহি' বা নিষেধের শব্দ দেখলেই বুঝতে হবে শরিয়ত সেই কাজটি পছন্দ করে না। যদি দলিল শক্তিশালী হয়, তবে তা হারাম; আর দলিল কিছুটা দুর্বল হলে তা মাকরূহে তাহরিমি।

প্রশ্ন ৯: কারখীর মতে বিধান উদ্ভাবনে আম (العام) ও খাস (الخاص)-এর মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্ট কর।
(بين العلاقة بين العام والخاص في استنباط الأحكام عند الكرخي)

উত্তর:

ভূমিকা:
কুরআন ও সুন্নাহর শব্দাবলীর ব্যাপকতা ও নির্দিষ্টতা বোঝার জন্য 'আম' (সাধারণ) ও 'খাস' (নির্দিষ্ট)-এর জ্ঞান অপরিহার্য। ইমাম কারখী (রহ.)-এর উসুলে এই দুটির সম্পর্ক বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সংজ্ঞা (التعريف):

- **আম (العام):** এমন শব্দ যা তার অর্থের মধ্যে অগণিত বা অনির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন—'মানুষ', 'মুসলিমগণ'।
- **খাস (الخاص):** এমন শব্দ যা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সংখ্যা বোঝায়। যেমন—'জায়েদ', 'একজন পুরুষ'।

কারখীর মূলনীতি ও সম্পর্ক (القاعدة عند الكرخي):
ইমাম কারখী (রহ.) ও হানাফী ফকীহগণের মতে, বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে 'আম' ও 'খাস'-এর সম্পর্ক হলো—'আম' তার ব্যাপক অর্থের ওপর প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ না 'খাস' এসে তাকে নির্দিষ্ট করে দেয়।

মূলনীতি:
"الْعَامُّ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ قَطْعًا حَتَّى يَرِدَ الْمُخَصِّصُ"

অর্থ: 'আম' বা সাধারণ শব্দ নিশ্চিতভাবে তার সকল অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিকে বোঝাবে, যতক্ষণ না নির্দিষ্টকারী বা 'মুখাসসিস' কোনো দলিল আসে।

সম্পর্কের ধরণ:
১. খাস দ্বারা আমের ব্যাখ্যা (التخصيص): যদি কোনো বিষয়ে একটি সাধারণ (আম) আয়াত থাকে এবং অন্য জায়গায় একটি নির্দিষ্ট (খাস) হাদিস পাওয়া যায়, তবে 'খাস' দলিলটি 'আম' দলিলের ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবে এবং 'আম'-এর ব্যাপকতাকে সংকুচিত করবে। একে 'তাখসিস' বলা হয়।

২. বিরোধের ক্ষেত্রে: যদি 'আম' ও 'খাস' একই সময়ে এবং একই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরোধী হয়, তবে হানাফী উসূলে 'খাস' দলিলটি 'আম'-এর ওপর প্রবল হবে এবং 'আম'কে নির্দিষ্ট অংশের জন্য রহিত করে দেবে।

উদাহরণ (المثال):
আল্লাহ তাআলা কুরআনে সাধারণভাবে বলেছেন:

"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" (আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন)।

এটি 'আম' বা সাধারণ নির্দেশ। কিন্তু হাদিসে এসেছে:

"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" (রাসূল সা. ধোঁকাপূর্ণ বেচাকেনা নিষেধ করেছেন)।

এটি 'খাস' বা নির্দিষ্ট নির্দেশ। এখানে 'খাস' দলিলটি 'আম' দলিলের হুকুমকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। অর্থাৎ, সব বেচাকেনা হালাল হলেও ধোঁকাপূর্ণ বেচাকেনা হালাল নয়।

উপসংহার:
ইমাম কারখীর মতে, 'আম' নিজেই একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল। বিনা কারণে এর অর্থকে সংকুচিত করা যাবে না। তবে যখন 'খাস' দলিল পাওয়া যায়, তখন উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করে বিধান সাব্যস্ত করতে হবে।

প্রশ্ন ১০: "আল আসলু ফিল আশয়াই আল-ইবাহা" (বস্তুসমূহে মূল হলো বৈধতা) কায়দাটির উদ্দেশ্য কী?
(ما هو المراد من قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:
মানবজীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল্লাহ তাআলা অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এই বস্তুগুলো ব্যবহারের বিধান কী হবে—তা নির্ধারণে ফিকহ শাস্ত্রে একটি চমৎকার মূলনীতি রয়েছে, যা 'আসলে ইবাহাত' নামে পরিচিত।

কায়দাটির অর্থ (معنى القاعدة):

ইমাম কারখী (রহ.) ও অধিকাংশ হানাফী ফকীহগণের মতে, জাগতিক বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো:
"الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ"
(অর্থ: বস্তুসমূহে মূল হলো বৈধতা বা মুবাহ হওয়া।)

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা (المراد والتوضيح):
এই কায়দাটির মূল উদ্দেশ্য হলো—পৃথিবীর যেকোনো বস্তু বা কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল বা বৈধ বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ না শরিয়তে তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো দলিল (নস) পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, কোনো ফল, খাবার, পোশাক বা নতুন কোনো আবিষ্কার সম্পর্কে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, "এটি কি জায়েজ?" তবে উত্তর হবে—"হ্যাঁ, জায়েজ।" কারণ, এটি হারাম হওয়ার কোনো দলিল নেই। হারাম হওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন হয়, হালাল হওয়ার জন্য আলাদা দলিলের প্রয়োজন নেই।

দালিলিক ভিত্তি:
আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন:

"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"

(অর্থ: তিনি সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের (উপকারের) জন্য সৃষ্টি করেছেন।)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষের উপকার সাধন ও বৈধ ব্যবহার।

উদাহরণ (المثال):
ধরুন, এমন একটি নতুন ফল পাওয়া গেল যার নাম কুরআনে বা হাদিসে নেই। এখন কারখীর এই নীতি অনুযায়ী, ফলটি খাওয়া হালাল হবে। কারণ, শরিয়তে একে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

উপসংহার:
এই নীতিটি ইসলামি শরিয়তের সহজতা ও উদারতার প্রমাণ। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা আরোপ করেননি, বরং নিষেধাজ্ঞার স্পষ্ট কারণ ছাড়া সবকিছুকে মানুষের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন।

প্রশ্ন ১১: হানাফী মাযহাবে ইসতিহসান (পছন্দনীয় বিধান)-এর উপর আমল করার প্রমাণ কী?

(ما هي حجة العمل بـ الاستحسان في المذهب الحنفي؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

হানাফী ফিকহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 'ইসতিহসান'-এর ব্যবহার। যখন বাহ্যিক কিয়াস (যুক্তি) কোনো সমস্যার সমাধানে কঠোরতা বা অসামঞ্জস্য তৈরি করে, তখন ফকীহগণ গভীরতর দলিলের ভিত্তিতে সহজতর সমাধান গ্রহণ করেন, একেই ইসতিহসান বলে।

ইসতিহসানের প্রমাণ বা হুজ্জাত (حجة الاستحسان):

হানাফী মাযহাবে ইসতিহসান কোনো মনগড়া রায় নয়, বরং এটি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। নিচে এর প্রধান দলিলগুলো দেওয়া হলো:

১. কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

"وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم"

(অর্থ: তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার মধ্যে যা উত্তম, তোমরা তার অনুসরণ কর।)

এখানে 'আহসান' বা উত্তম পন্থা অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ইসতিহসানের ভিত্তি।

২. সুন্নাহ/আসার-এর দলিল:

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি উক্তি হানাফী উসুলে ইসতিহসানের বড় দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়:

"مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ"

(অর্থ: মুসলমানগণ যে বিষয়টিকে ভালো বা কল্যাণকর মনে করেন, আল্লাহর কাছেও তা ভালো।)

এই হাদিস (মাওকুফ) প্রমাণ করে যে, উম্মতের মুজতাহিদগণ যদি কোনো বিধানকে জনকল্যাণে উত্তম মনে করেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য।

৩. যৌক্তিক প্রমাণ (الدليل العقلي):

শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ (মাসলাহা) এবং কষ্ট দূর করা (রফে হারাজ)। কিয়াসের ওপর আমল করলে যদি মানুষের কষ্ট হয়, তবে সেই কিয়াস বর্জন করে সহজ বিধান দেওয়া শরিয়তের রুচি ও মাকাসিদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উদাহরণ:

পশু বা পাখির ঝুটা বা উৎচ্ছিষ্ট পবিত্র কি না? বিড়াল ইঁদুর খেয়ে মুখ না ধুয়েই পানি পান করে। কিয়াস অনুযায়ী বিড়ালের ঝুটা নাপাক হওয়ার কথা। কিন্তু 'ইসতিহসান' ও হাদিসের আলোকে হানাফীগণ বলেন, যেহেতু বিড়াল ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়, তাই এর ঝুটা নাপাক সাব্যস্ত করলে মানুষের 'হারাজ' বা কষ্ট হবে। তাই এটি পাক (মাকরূহসহ)।

উপসংহার:

সুতরাং, ইসতিহসান হলো শরিয়তের গভীর প্রজ্ঞার ফসল। ইমাম কারখী (রহ.) ও হানাফী ইমামগণ একে কুরআন-সুন্নাহর আলোকেই গ্রহণ করেছেন, খেয়ালখুশি মতো নয়।

প্রশ্ন ১২: কারখীর মতে কখন প্রকাশ্য অর্থ (জাহিরুন নাস) দলিল হিসেবে গণ্য হয়? (متى يعتبر الظاهر (ظاهر النص) حجة عند الكرخي؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

কুরআন ও হাদিসের শব্দাবলীর অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে 'জাহির' বা প্রকাশ্য অর্থের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম কারখী (রহ.) তাঁর উসুল গ্রন্থে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।

জাহির দলিল হওয়ার শর্ত (شرط حجية الظاهر):

ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, নস বা টেক্সটের প্রকাশ্য অর্থ (জাহির) সর্বদা দলিল হিসেবে গণ্য হবে, তবে একটি শর্ত সাপেক্ষে।

তাঁর মূলনীতিটি হলো:

"الْأَصْلُ أَنَّ الْكَلَامَ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ"

অর্থ: বাক্যের অর্থ তার প্রকাশ্য বা জাহির অর্থের ওপরই প্রয়োগ করা হবে, যতক্ষণ না তার বিপরীত কোনো দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্লেষণ:

১. প্রাথমিক বিধান: কোনো আয়াত বা হাদিস শোনার পর অভিধানে তার যে অর্থ পাওয়া যায়, মুজতাহিদকে প্রাথমিকভাবে সেই অর্থের ওপরই আমল করতে হবে। এটি ওয়াজিব।

২. বিপরীত দলিলের উপস্থিতি: যদি এমন কোনো দলিল পাওয়া যায় যা প্রমাণ করে যে, এখানে প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং রূপক (মাজাজ) বা বিশেষ কোনো অর্থ উদ্দেশ্য, কেবল তখনই জাহির অর্থ ত্যাগ করা যাবে।

৩. বিনা দলিলে ত্যাগ করা: বিপরীত কোনো দলিল ছাড়া শুধু যুক্তি বা ধারণার বশবর্তী হয়ে জাহির অর্থ ত্যাগ করা বা তাবিল (ব্যাখ্যা) করা জায়েজ নেই।

উদাহরণ (المثال):

কুরআনে বলা হয়েছে: "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ" (তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ কর)।

এখানে 'মাসেহ' শব্দের জাহির বা প্রকাশ্য অর্থ হলো ভেজা হাত বুলানো। এখন কেউ যদি বলে যে, এখানে মাসেহ মানে 'মাথা ধৌত করা' বা অন্য কিছু, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, জাহির অর্থের বিপরীতে কোনো দলিল নেই।

উপসংহার:

ইমাম কারখীর মতে, 'জাহির' হলো শরিয়তের বিধান বোঝার প্রথম ধাপ। এটি নিশ্চিত (কাতয়ী) না হলেও প্রবল ধারণা (জন্নে গালিব) সৃষ্টি করে, যার ওপর আমল করা অপরিহার্য, যতক্ষণ না অন্য কোনো শক্তিশালী দলিল একে বাধা দেয়।

প্রশ্ন ১৩: খাসকে আমের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কারখীর কায়দাটি কী, তা সুস্পষ্ট কর।
(بين قاعدة الكرخي في تقديم الخاص على العام)

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের বিধান নির্ণয়ে 'আম' (সাধারণ) ও 'খাস' (নির্দিষ্ট) দলিলের মধ্যকার বিরোধ নিরসন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হানাফী উসুলবিদ ইমাম কারখী (রহ.) এ ক্ষেত্রে 'খাস'-কে প্রাধান্য দেওয়ার একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করেছেন।

মূলনীতি (القاعدة):

ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, যখন কোনো বিষয়ে 'আম' ও 'খাস' দলিল পরস্পর বিরোধী হয়, তখন 'খাস' দলিলটি 'আম'-এর ওপর প্রবল হবে।

নীতিটি হলো:

"الْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ عِنْدَ التَّعَارُضِ"

(অর্থ: বিরোধের সময় খাস বা নির্দিষ্ট দলিল সাধারণ দলিলের ওপর অগ্রাধিকার পাবে।)

ব্যাখ্যা ও প্রয়োগবিধি (الشرح والتطبيق):

হানাফী উসুলে 'আম' শব্দ তার অর্থের ওপর নিশ্চিতভাবে (কাতয়ীভাবে) প্রযোজ্য হয়। কিন্তু যখন এর বিপরীতে কোনো 'খাস' দলিল আসে, তখন বিধানের পরিবর্তন ঘটে। ইমাম কারখীর মতে এই পরিবর্তন দুইভাবে হতে পারে:

১. তাখসিস (التخصيص): যদি 'আম' ও 'খাস' দলিল একই সময়ে অবতীর্ণ হয় বা সংযুক্ত থাকে, তবে 'খাস' দলিলটি 'আম'-এর ব্যাপকতা কমিয়ে নির্দিষ্ট করে দেবে।

২. নাসখ বা রহিতকরণ (النسخ): যদি 'আম' বিধান আগে আসে এবং 'খাস' বিধান পরে আসে, তবে হানাফী মতে পরবর্তী 'খাস' দলিলটি পূর্ববর্তী 'আম' বিধানের ওই নির্দিষ্ট অংশকে 'মানসুখ' বা রহিত করে দেবে।

উদাহরণ (المثال):

কুরআনে সাধারণভাবে বলা হয়েছে:

"وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"

(তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েজ পরিমাণ সময় ইদ্দত পালন করবে।) [সূরা বাকারা: ২২৮]

এটি একটি 'আম' হুকুম, যা সব তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য প্রযোজ্য।

কিন্তু অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ"

(যদি তোমরা মুমিন নারীদের বিয়ে কর এবং স্পর্শ করার (সহবাসের) আগেই তালাক দাও, তবে তাদের কোনো ইদ্দত নেই।) [সূরা আহযাব: ৪৯]

এটি একটি 'খাস' হুকুম। এখানে 'খাস' আয়াতটি 'আম' আয়াতের হুকুমকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। অর্থাৎ, সব তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত আছে, কিন্তু 'স্পর্শ করার আগে তালাকপ্রাপ্তা' নারীর ইদ্দত নেই।

উপসংহার:

ইমাম কারখীর এই নীতির ফলে শরিয়তের বিধানগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে এবং আপাতদৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ মনে হওয়া দলিলগুলোর সঠিক সমাধান পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১৪: কারখীর মতে কখন প্রথা (উরফ) বিধানের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গণ্য হয়? (متى يكون العرف والعادة حجة في الأحكام عند الكرخي؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি ফিকহে 'উরফ' বা সমাজের প্রচলিত প্রথা একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যখন কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশনা (নস) পাওয়া যায় না, তখন ফকীহগণ 'উরফ'-এর আশ্রয় নেন।

মূলনীতি (القاعدة):

ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, শর্তহীন বা অস্পষ্ট বিষয়গুলোর অর্থ নির্ধারণে ‘উরফ’ বা ‘আদাত’ বিচারকের ভূমিকা পালন করে।

তাঁর কিতাবে বর্ণিত নীতিটি হলো:

"الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى مُتَعَارَفِهِ فِي كَلَامِ النَّاسِ"

(অর্থ: শর্তহীন বা সাধারণ কথা মানুষের কথার মধ্যে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কার্যকর হবে।)

অথবা বিখ্যাত ফিকহী কায়দা:

"الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ"

(অর্থ: প্রথা বা রীতিনীতি ফয়সালাকারী হিসেবে গণ্য।)

কখন দলিল হবে (শর্তসমূহ):

ইমাম কারখীর মতে উরফ দলিল হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে:

১. নস-এর অনুপস্থিতি: বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন বা হাদিসে যদি নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট কোনো বিধান না থাকে।

২. নস-এর বিরোধী না হওয়া: প্রথাটি যদি শরিয়তের কোনো স্পষ্ট হারামের সাথে সাংঘর্ষিক হয় (যেমন—সুদের প্রথা), তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. ব্যাপক প্রচলন: প্রথাটি সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে প্রচলিত হতে হবে।

উদাহরণ (المثال):

কেউ কসম খেল, "আমি গোশত খাব না"। এরপর সে মাছ খেল।

শাব্দিক অর্থে (লুগাত) মাছ এক প্রকার গোশত (পবিত্র কুরআনেও মাছকে ‘লাহম’ বা গোশত বলা হয়েছে)। কিন্তু মানুষের প্রচলিত প্রথায় (উরফ) মাছকে ‘গোশত’ বলা হয় না; বরং গোশত বলতে সাধারণত গরু, ছাগল বা মুরগির মাংস বোঝায়।

কারখীর নীতি অনুযায়ী, এখানে আভিধানিক অর্থ বাদ দিয়ে 'উরফ' গ্রহণ করা হবে। তাই মাছ খেলে তার কসম ভাঙবে না।

উপসংহার:

সুতরাং, ইমাম কারখীর মতে, মানুষের দৈনন্দিন লেনদেন, কসম এবং চুক্তির ক্ষেত্রে শব্দের আভিধানিক অর্থের চেয়ে প্রচলিত বা 'উরফি' অর্থ বেশি শক্তিশালী, যদি তা শরিয়তের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

প্রশ্ন ১৫: নীরবতা দ্বারা ব্যাখ্যার (আল-বায়ান বিস-সুকুত) বিষয়ে কারখীর কায়দাটি কী?

(ما هي قاعدة الكرخي حول البيان بالسكوت؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সাধারণত কথা বা উক্তির মাধ্যমেই মানুষের মনের ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে 'চুপ থাকা' বা 'নীরবতা' সম্মতির লক্ষণ হিসেবে গণ্য হয়। উসুলুল ফিকহে একে 'বায়ান বিস-সুকুত' বলা হয়।

মূলনীতি (القاعدة):

ইমাম কারখী (রহ.) ও হানাফী ফকীহগণের মতে, নীরবতা সবসময় সম্মতির লক্ষণ নয়, তবে বিশেষ প্রয়োজনে তা বক্তব্যের স্থলাভিষিক্ত হয়।

বিখ্যাত মূলনীতিটি হলো:

"لاَ يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ، لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ"

অর্থ: কোনো নীরব ব্যক্তির দিকে কোনো কথা বা উক্তি নিসবত করা (আরোপ করা) যাবে না; কিন্তু কথা বলার প্রয়োজনীয় মুহূর্তে চুপ থাকাটা 'বক্তব্য' বা 'সম্মতি' হিসেবে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা (التوضيح):

একজন মানুষ চুপ থাকলে সাধারণত তাকে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলা যায় না। কিন্তু এমন পরিস্থিতি যদি তৈরি হয় যেখানে তার কথা বলা বা প্রতিবাদ করা জরুরি ছিল, অথচ সে চুপ করে আছে, তখন এই নীরবতাকে তার সম্মতি বা স্বীকৃতি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

উদাহরণ (أمثلة):

১. কুমারীর বিয়ে: যখন কোনো অভিভাবক একজন প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী মেয়ের কাছে বিয়ের অনুমতি চায় এবং মেয়েটি লজ্জা পেয়ে চুপ থাকে, হাসে বা কাঁদে (শব্দহীনভাবে), তখন ইমাম কারখীর মতে এই নীরবতাই তার সম্মতি। কারণ, এখানে তার মতামত জানানো জরুরি ছিল, আর কুমারী মেয়েদের জন্য চুপ থাকাটাই সম্মতির প্রথা।

২. রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ (তাকরীর): সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর সামনে কোনো কাজ করেছেন, আর তিনি দেখেও চুপ ছিলেন (নিষেধ করেননি)। এই নীরবতা প্রমাণ করে যে কাজটি জায়েজ। একে 'হাদিসে তাকরীরি' বলা হয়।

উপসংহার:

ইমাম কারখীর এই নীতিটি ফিকহী মাসআলা সমাধানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, ইসলামি আইন কেবল মুখের কথার ওপর নির্ভর করে না, বরং পরিস্থিতির দাবি ও মানুষের মনস্তত্ত্বকেও গুরুত্ব দেয়।

প্রশ্ন ১৬: উসুলুল ফিকহে "নাসখ" (রহিতকরণ)-এর সংজ্ঞা কী? (ما هو تعريف "النسخ" في أصول الفقه؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের বিধানগুলো পর্যায়ক্রমে এবং মানুষের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির আলোকে অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী কোনো বিধানকে পরবর্তী কোনো বিধান দ্বারা পরিবর্তন বা বাতিল করার নামই হলো 'নাসখ'। উসুলুল ফিকহে নাসখ-এর আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংজ্ঞা (التعريف):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'নাসখ' (النَّسْخُ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো—মুছে ফেলা (الإزالة), পরিবর্তন করা (التغيير) বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা (النقل)। যেমন বলা হয়—"নাসানাত হাশ শামসুজ জিল্লা" (সূর্য ছায়াকে অপসারণ করেছে)।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** উসুলবিদগণের পরিভাষায়:

"رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ"

(অর্থ: পূর্ববর্তী কোনো শরিয়ি বিধানকে পরবর্তী কোনো শরিয়ি দলিলের মাধ্যমে উঠিয়ে নেওয়া বা রহিত করা।)

বিশ্লেষণ:

ইমাম কারখী (রহ.) ও হানাফী উসুলবিদদের মতে, নাসখ হলো বিধানের সময়সীমা শেষ হওয়ার ঘোষণা। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই জানতেন যে এই হুকুমটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যখন সেই সময় শেষ হলো, তখন নতুন দলিলের মাধ্যমে আগের হুকুমটি তুলে নেওয়া হলো।

শর্তসমূহ:

১. দুটি বিধানের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ থাকতে হবে।

২. রহিতকারী দলিলটি (নাসিখ) সময়ের দিক থেকে পরে আসতে হবে।

৩. উভয় দলিল শরিয়তের দলিল হতে হবে (যেমন—কুরআন বা সুন্নাহ)।

উদাহরণ (المثال):

ইসলামের শুরুতে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়ার হুকুম ছিল। পরবর্তীতে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তা 'মানসুখ' (রহিত) করে কাবার দিকে নামাজ পড়ার হুকুম দেওয়া হয়।

উপসংহার:

নাসখ শরিয়তের নমনীয়তা ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার কল্যাণে সময়ের চাহিদানুপাতে বিধান পরিবর্তন করেছেন।

প্রশ্ন ১৭: খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কিতাবকে নাসখ করা কি বৈধ? এবং এ বিষয়ে কারখীর কায়দা কী?
(هل يجوز نسخ الكتاب بـ خبر الواحد؟ وما هي قاعدة الكرخي في ذلك؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের দলিলগুলোর শক্তিমত্তা বা 'কুওয়াত'-এর স্তরবিন্যাস রয়েছে। কুরআন হলো সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল (কাতয়ী), আর খবরে ওয়াহেদ (একক বর্ণনাকারীর হাদিস) হলো তুলনামূলক দুর্বল বা জন্নী (ধারণাপ্রসূত) দলিল। সবল দলিল দুর্বল দলিল দ্বারা রহিত হতে পারে কি না, তা নিয়ে ইমাম কারখী (রহ.)-এর একটি স্পষ্ট মূলনীতি রয়েছে।

মূল বিধান (الحُكْم):

হানাফী মাযহাব ও ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কুরআনের আয়াত বা 'কিতাবুল্লাহ' নাসখ করা জায়েজ নেই।

ইমাম কারখীর মূলনীতি (قاعدة الكرخي):

ইমাম কারখী (রহ.) তাঁর উসুল গ্রন্থে এই বিষয়ে যে মূলনীতিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা হলো:

"الْأَصْلُ أَنَّ الْكِتَابَ لَا يُنْسَخُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ"

(অর্থ: মূলনীতি হলো—কিতাবুল্লাহ (কুরআন) খবরে ওয়াহেদ দ্বারা রহিত হয় না।)

অথবা দলিলের শক্তির বিচারে বিখ্যাত নীতি:

"الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ"

(নিশ্চিত বিষয় সন্দেহের দ্বারা দূরীভূত হয় না।)

যুক্তি ও ব্যাখ্যা:

১. দলিলের মান: কুরআন 'মুতাওয়াতির' সূত্রে প্রমাণিত, যা অকাট্য বা 'কাতয়ী' (قطعي الثبوت)। অন্যদিকে, খবরে ওয়াহেদ 'জন্নী' (ظني الثبوت) বা প্রবল ধারণাপ্রসূত।

২. শক্তির পার্থক্য: শক্তিশালী বিষয়কে দুর্বল বিষয় দ্বারা রহিত করা অযৌক্তিক। তাই কুরআনের আয়াত কেবল কুরআনের আয়াত বা মুতাওয়াতির সুন্নাহ দ্বারাই রহিত হতে পারে।

উদাহরণ (المثال):

কুরআনে চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন যদি কোনো খবরে ওয়াহেদ পাওয়া যায় যা হাত কাটাকে বাতিল করে দেয়, তবে হানাফী উসুলে সেই হাদিস দিয়ে কুরআনের হুকুম বাতিল করা যাবে না।

উপসংহার:

ইমাম কারখীর এই নীতি কুরআনের মর্যাদা রক্ষায় অত্যন্ত কার্যকর। এটি শরিয়তের বিধানকে অস্থিতিশীল হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং অকাট্য দলিলের প্রাধান্য বজায় রাখে।

প্রশ্ন ১৮: দুটি কিয়াসের বিরোধের বিষয়ে কারখীর কায়দাটি কী, তা সুস্পষ্ট কর। (بين قاعدة الكرخي حول تعارض القياسين)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ফকীহগণ কোনো নতুন মাসআলার সমাধানের জন্য 'কিয়াস' (সাদৃশ্যপূর্ণ অনুমান) ব্যবহার করেন। অনেক সময় একই মাসআলায় একাধিক কিয়াস বা যুক্তি সামনে আসে যা পরস্পর বিরোধী। একে 'তাআরুজুল কিয়াসাইন' বলা হয়।

ইমাম কারখীর মূলনীতি (قاعدة الكرخي):

যখন দুটি কিয়াস পরস্পর বিরোধী হয়, তখন ইমাম কারখী (রহ.)-এর নীতি হলো 'তারজিহ' বা প্রাধান্য দেওয়া। যদি কোনো একটি কিয়াসের পক্ষে অতিরিক্ত কোনো দলিল থাকে, তবে সেটি গ্রহণ করতে হবে।

নীতিটি হলো:

"إِذَا تَعَارَضَ قِيَاسَانِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا قُوَّةٌ لَمْ تُوجَدْ فِي الْآخَرِ، أُخِذَ بِهِ"

(অর্থ: যখন দুটি কিয়াস পরস্পর বিরোধ করে, তখন যদি একটির মধ্যে এমন শক্তি থাকে যা অন্যটিতে নেই, তবে শক্তিশালীটি গ্রহণ করা হবে।)

কিভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়?

১. নস-এর সমর্থন: যে কিয়াসটির পক্ষে কুরআন বা হাদিসের কোনো ইশারা বা সমর্থন পাওয়া যায়, সেটি অন্যটির চেয়ে প্রবল হবে।

২. ইল্লত বা কারণের শক্তি: যে কিয়াসের 'ইল্লত' (কারণ) শরিয়তের মাকাসিদের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা গ্রহণ করা হবে।

৩. তাসাকুত (ঝরে পড়া): যদি উভয় কিয়াস সমান শক্তিশালী হয় এবং কোনোটিকে প্রাধান্য দেওয়ার উপায় না থাকে, তবে উভয়টি বাতিল (তাসাকুত) হয়ে যাবে এবং মুজতাহিদ অন্য কোনো দলিল খুঁজবেন।

ইসতিহসানের সম্পর্ক:

অনেক সময় একটি কিয়াস 'জালি' (প্রকাশ্য) হয়, আর অন্যটি 'খফি' (সূক্ষ্ম) হয়। হানাফী উসুলে সাধারণ কিয়াসের চেয়ে সূক্ষ্ম কিয়াস বা 'ইসতিহসান'-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যদি তা মানুষের কল্যাণে অধিক উপযোগী হয়।

উদাহরণ (المثال):

চামড়া দাবাগাত (প্রক্রিয়াজাত) করার পর তা পাক হবে কি না?

- এক কিয়াস বলে: নাপাক, কারণ মৃত্যুর দ্বারা চামড়া নাপাক হয়ে গেছে (যেমন গোশত)।
- অন্য কিয়াস (ও হাদিস) বলে: পাক, কারণ এর আর্দ্রতা ও নাপাকি শুকিয়ে ফেলা হয়েছে (যেমন কাপড় ধোয়া)।

এখানে দ্বিতীয় কিয়াসটি শক্তিশালী, কারণ এর পক্ষে হাদিস রয়েছে ("দাবাগাতই চামড়ার পবিত্রতা")। তাই কারখীর নীতিতে এটিই গ্রহণীয়।

উপসংহার:

ইমাম কারখীর মতে, বিরোধপূর্ণ কিয়াসের ক্ষেত্রে মুজতাহিদকে অন্ধভাবে যেকোনো একটি গ্রহণ না করে, গভীর দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে শক্তিশালী যুক্তিটি বেছে নিতে হবে।

প্রশ্ন ১৯: কারখীর মতে "দুখুলুল বা'দ ফিল কুল" (অংশকে সমগ্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা) কায়দাটি উল্লেখ কর।
(اذكر قاعدة "دخول البعض في الكل" عند الكرخي)

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের বিধান পালনের ক্ষেত্রে কখনো কখনো একাধিক কারণ বা 'সাবাব' একত্রিত হয়। তখন প্রতিটি কারণের জন্য আলাদা আমল করা জরুরি, নাকি একটি আমলই সকলের জন্য যথেষ্ট—তা নির্ধারণে 'দুখুলুল বা'দ ফিল কুল' বা 'তাদাকুল' (تداخل)-এর নীতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মূলনীতি (القاعدة):

ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, যখন একই জাতীয় একাধিক কারণ একত্রিত হয়, তখন একটি আমল বা কাজ অন্যটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। একে 'তাদাকুল' বা 'অংশ সমগ্রের মধ্যে প্রবেশ করা' বলা হয়।

নীতিটি হলো:

"الْأَصْلُ أَنَّ الْجِنْسَ إِذَا فُعِلَ بِهِ مَا يَجِبُ فِي جِنْسِهِ، دَخَلَ بَعْضُهُ فِي الْكُلِّ"

(অর্থ: মূলনীতি হলো—যখন একই জাতীয় একাধিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ওই জাতীয় কোনো একটি ওয়াজিব পালন করা হয়, তখন তার একাংশ সমগ্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।)

ব্যাখ্যা (التوضيح):

যদি কোনো ব্যক্তির ওপর একই ধরনের একাধিক দায়িত্ব বা ওয়াজিব অর্পিত হয় এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য (মাকসাদ) এক হয়, তবে আলাদা আলাদাভাবে আদায় না করে একবার আদায় করলেই সবগুলো আদায় হয়ে যাবে।

উদাহরণ (المثال):

১. ওযু ও অপবিত্রতা: যদি কারো ওযু ভঙ্গের একাধিক কারণ ঘটে (যেমন—ঘুমালো এবং রক্ত বের হলো), তবে তাকে দুইবার ওযু করতে হবে না। বরং একবার ওযু করলেই (যা 'অংশ') তা সব কারণের (যা 'সমগ্র') জন্য যথেষ্ট হবে।

2. মসজিদে প্রবেশ: কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে ফরজ নামাজ আদায় করে, তবে তার ওপর 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'-এর যে হক ছিল, তা ওই ফরজ নামাজের মধ্যে 'দুখুল' বা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আলাদা করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ না পড়লেও চলবে।

উপসংহার:

এই নীতিটি শরিয়তের সহজীকরণের (তাসহিল) একটি বড় প্রমাণ। এর ফলে বান্দার ওপর থেকে অপ্রয়োজনীয় কষ্ট লাঘব হয়।

প্রশ্ন ২০: কারখীর মাযহাবে "আল-ইহতিয়াতু ফিল ইবাদাত" (ইবাদতে সতর্কতা) কায়দাটি কী, তা সুস্পষ্ট কর।
(بين قاعدة "الاحتياط في العبادات" في مذهب الكرخي)

উত্তর:

ভূমিকা:

একজন মুমিনের প্রধান লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাই ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ বা সংশয় দেখা দিলে ফকীহগণ এমন পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেন, যাতে দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। একেই 'ইহতিয়াত' বা সতর্কতা বলা হয়।

মূলনীতি (القاعدة):

ইমাম কারখী (রহ.) ও হানাফী উসুলের প্রসিদ্ধ নীতি হলো, ইবাদতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব বা আবশ্যক।

কায়দাটি হলো:

"الْأَصْلُ هُوَ الْأَخْذُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ"

(অর্থ: মূলনীতি হলো—ইবাদতের অধ্যায়ে সতর্কতা বা ইহতিয়াত গ্রহণ করাই মূল বা আসল।)

ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ (الشرح والتطبيق):

পার্থিব লেনদেন (মুয়ামালাত)-এর ক্ষেত্রে সাধারণত 'ইস্তিশাব' বা আগের অবস্থার ওপর অটল থাকার নীতি চলে। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে যদি সন্দেহ হয় যে, ইবাদতটি বাতিল হয়েছে কি না, তবে সতর্কতা হিসেবে ধরে নিতে হবে যে বাতিল হয়েছে এবং পুনরায় তা আদায় করতে হবে। কারণ, এতে জিম্মাদারি আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

উদাহরণ (المثال):

১. ওযুর সন্দেহ: যদি কেউ নিশ্চিত থাকে যে সে ওযু করেছিল, কিন্তু পরে ওযু ভেঙেছে কি না—এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে আগের ওযু বহাল থাকবে। কিন্তু হানাফী মতে (বিশেষত নামাজের শুরুতে), নতুন করে ওযু করাটা 'ইহতিয়াত' বা সতর্কতার দাবি, যাতে নামাজ নিঃসন্দেহে সহীহ হয়।

২. রোজার ইফতার: আকাশ মেঘলা থাকলে সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ইফতার করা যাবে না। এখানে দেরি করা বা সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

উপসংহার:

ইমাম কারখীর মতে, বান্দার হকের চেয়ে আল্লাহর হক আদায়ে বেশি সতর্কতা প্রয়োজন। তাই ইবাদতে সন্দেহের কোনো স্থান নেই; বরং যা নিশ্চিত ও নিরাপদ, তাই গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ২১: কারখীর উসুলে সাদ্দে যারাই (অনিষ্টের পথ বন্ধ করা)-এর ভূমিকা কী? (ما هو دور سد الذرائع في أصول الكرخي؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

'সাদ্দে যারাই' (سَدُّ الذَّرَائِعِ)-এর অর্থ হলো—অনিষ্টের মাধ্যম বা পথ বন্ধ করে দেওয়া। যদিও এটি মালিকি মাযহাবের একটি প্রধান মূলনীতি, তবে হানাফী উসুলে এবং ইমাম কারখী (রহ.)-এর নীতিমালায় এর পরোক্ষ কিন্তু শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে।

কারখীর উসুলে এর ভূমিকা (دورها عند الكرخي):

ইমাম কারখী (রহ.) সরাসরি 'সাদ্দে যারাই' শব্দ ব্যবহার না করলেও, তিনি 'মুকাদ্দিমাতুল হারাম' (হারামের ভূমিকা) বা হারাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এমন মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করার নীতি অনুসরণ করেন।

মূলনীতি:

"مَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ"

(অর্থ: যা হারামের দিকে নিয়ে যায়, তাও হারাম।)

ভূমিকা ও প্রয়োগ:

১. হারামের মাধ্যম রোধ: যে কাজগুলো বাহ্যত বৈধ, কিন্তু তা করলে নিশ্চিতভাবে বা প্রবল ধারণায় কোনো হারাম কাজ সংঘটিত হবে, ইমাম কারখী (রহ.)-এর উসুল অনুযায়ী সেই বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

২. কৌশল প্রতিরোধ: মানুষ যেন শরিয়তের বিধান ফাঁকি দেওয়ার জন্য কোনো হিলা বা কৌশল (অসৎ উদ্দেশ্যে) অবলম্বন করতে না পারে, সে জন্য এই নীতি প্রয়োগ করা হয়।

উদাহরণ (المثال):

জুমার আজানের পর বেচাকেনা: বেচাকেনা করা এমনিতে হালাল। কিন্তু জুমার আজানের পর বেচাকেনা করলে নামাজ ছুটে যাওয়ার বা বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে

(যা হারাম)। তাই 'সাদ্দে যারাই' বা হারামের পথ বন্ধ করার স্বার্থে আজানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে [সূত্রঃ সূরা জুমুআ]।

উপসংহার:

ইমাম কারখীর উসুলে সাদ্দে যারাই-এর ভূমিকা হলো—পাপের উৎস মূলেই বিনাশ করা। এটি ফিকহী মাসআলায় হারাম থেকে বাঁচার জন্য একটি সুরক্ষাপ্রাচীর (Safety measure) হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ২২: কারখী সহীহ চুক্তি এবং বাতিল চুক্তির মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করেন? (كيف يفرق الكرخي بين العقد الصحيح والعقد الباطل؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি অর্থনীতি ও লেনদেনে (মুয়ামালাত) চুক্তির বিশুদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হানাফী ফিকহ ও ইমাম কারখী (রহ.)-এর উসুল অনুযায়ী, সব চুক্তি এক পর্যায়ের নয়। মূলত চুক্তির উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে 'সহীহ' ও 'বাতিল'-এর পার্থক্য করা হয়।

সংজ্ঞা ও স্বরূপ (التعريف والماهية):

১. সহীহ চুক্তি (العقد الصحيح): যে চুক্তির 'আসল' (মূল ভিত্তি) এবং 'ওয়াসফ' (গুণাগুণ)—উভয়ই শরিয়তসম্মত। অর্থাৎ, চুক্তির রুকন বা স্তম্ভগুলো ঠিক আছে এবং তাতে কোনো অবৈধ শর্ত নেই।

২. বাতিল চুক্তি (العقد الباطل): যে চুক্তির 'আসল' বা মূল ভিত্তিই শরিয়তসম্মত নয়। অর্থাৎ, চুক্তির প্রধান রুকন বা স্তম্ভেই ত্রুটি রয়েছে।

কারখীর পার্থক্য নির্ণয়ের মূলনীতি (الفرق عند الكرخي):

ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, সহীহ ও বাতিলের মূল পার্থক্য হলো 'হুকুম' বা ফলাফল সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে।

- **সহীহ:** এর দ্বারা শরয়ী ফলাফল (যেমন—মালিকানা বদল) তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়।
- **বাতিল:** এটি মূলত কোনো চুক্তিই নয়; এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই এবং এর দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয় না।

পার্থক্যকরণের ছক:

বিষয়	সহীহ চুক্তি (الصحيح)	বাতিল চুক্তি (الباطل)
মূল ভিত্তি (আসল)	শরিয়তসম্মত ও ত্রুটিমুক্ত।	শরিয়তবিরোধী বা ত্রুটিযুক্ত।
ফলাফল (হুকুম)	মালিকানা ও উপযোগিতা তৈরি করে।	কোনো ফলাফল বা মালিকানা তৈরি করে না।
অবস্থা	এটি শরিয়তে গ্রহণযোগ্য।	এটি অস্তিত্বহীন বা অনর্থক (Laghw) হিসেবে গণ্য।

উদাহরণ (المثال):

- **সহীহ:** দুইজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের মধ্যে হালাল মালের বেচাকেনা।
- **বাতিল:** মদ বা শুকর বেচাকেনা, অথবা কোনো পাগল ব্যক্তির বেচাকেনা। এখানে 'মাল' বা 'বিক্রেতা'—চুক্তির এই মূল স্তম্ভগুলোই শরিয়তসিদ্ধ নয়।

উপসংহার:

ইমাম কারখীর মতে, বাতিল চুক্তি মূলত কোনো চুক্তিই নয়, তা মরীচিকার মতো। পক্ষান্তরে, সহীহ চুক্তিই কেবল বান্দার অধিকার ও মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

প্রশ্ন ২৩: ব্যতিক্রম দ্বারা ব্যাখ্যার (আল-বায়ান বিল ইসতিছনা) বিষয়ে কারখীর কায়দাটি কী, তা সুস্পষ্ট কর।
(بين قاعدة الكرخي حول البيان بالاستثناء)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের কথাবার্তায় প্রায়ই ‘ইল্লা’ (إِلَّا) বা ‘ব্যতীত’ শব্দটি ব্যবহার করে আগের কথার কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়। উসুলুল ফিকহে একে ‘ইসতিছনা’ (الاستثناء) বলা হয়। ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, এটি মূলত বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা ‘বায়ান’-এর অন্তর্ভুক্ত।

কারখীর মূলনীতি (قاعدة الكرخي):

ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, ইসতিছনা বা ব্যতিক্রম হলো বাক্যের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে কথা বলা।

মূলনীতিটি হলো:

"الِاسْتِثْنَاءُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا"

(অর্থ: ইসতিছনা বা ব্যতিক্রমের পর যা অবশিষ্ট থাকে, মূলত বক্তা সেটি নিয়েই কথা বলেছেন বা হুকুম লাগিয়েছেন।)

ব্যাখ্যা (التوضيح):

অনেকে মনে করেন, ইসতিছনা মানে হলো—প্রথমে পুরো হুকুমটি সবার ওপর লাগল, তারপর ‘ইল্লা’ দিয়ে কিছু অংশ বের করে নেওয়া হলো। কিন্তু ইমাম কারখী (রহ.) বলেন, না; বরং ইসতিছনা প্রমাণ করে যে, বক্তার শুরু থেকেই উদ্দেশ্য ছিল কেবল অবশিষ্ট অংশটুকু। প্রথম অংশটি ছিল কেবল কথার গঠন, আর ‘ইল্লা’ দিয়ে তিনি তার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্ট (বায়ান) করলেন।

শর্ত (الشرط):

এই ব্যাখ্যার জন্য শর্ত হলো—ইসতিছনাটি মূল বাক্যের সাথে ‘মুত্তাসিল’ (সংযুক্ত) হতে হবে। যদি কেউ কথা বলে চুপ করে যায় এবং দীর্ঘ সময় পর ‘ইল্লা’ বলে ব্যতিক্রম করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তা ‘নাসখ’ বা প্রত্যাহার বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ (المثال):

কেউ বলল: "আমার কাছে তার ১০ টাকা পাওনা আছে, ১ টাকা ছাড়া।" (له علي عشرة إلا درهما).

কারখীর নীতি অনুযায়ী, এর অর্থ হলো—শুরু থেকেই বক্তার স্বীকারোক্তি হলো ৯ টাকার ব্যাপারে। সে ১০ বলে ১ বাদ দেয়নি, বরং '১০ বিয়োগ ১' বা ৯ বোঝাতেই এই বাক্য ব্যবহার করেছে।

উপসংহার:

সুতরাং, কারখীর মতে ইসতিছনা কোনো নতুন হুকুম নয়, বরং এটি অস্পষ্টতা দূর করে বক্তার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট করে দেয়। এটি 'বায়ান-ই-তাগয়ীর' (পরিবর্তনকারী ব্যাখ্যা)-এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ২৪: হুদুদের (নির্ধারিত শাস্তি) বিধান প্রমাণে খবরে ওয়াহেদ (একজনের বর্ণনা)-এর বিধান কী?
(ما هو حكم الخبر الواحد في إثبات أحكام الحدود (العقوبات المحددة)؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তে 'হুদুদ' (الحدود) হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কঠোর শাস্তি (যেমন—চুরি, জিনা বা অপবাদের শাস্তি)। যেহেতু এই শাস্তিগুলো মানুষের জান-মালের ওপর বড় আঘাত হানে, তাই এগুলো প্রমাণের জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতার প্রয়োজন হয়।

কারখীর বিধান ও মূলনীতি (الحكم والقاعدة عند الكرخي):

হানাফী উসুল ও ইমাম কারখী (রহ.)-এর সুস্পষ্ট মত হলো—খবরে ওয়াহেদ দ্বারা হুদুদ বা কিসাস সাব্যস্ত হয় না।

কারণ হিসেবে যে প্রসিদ্ধ ফিকহী কায়দাটি ব্যবহার করা হয়, তা হলো:

"الْحُدُودُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ"

(অর্থ: সন্দেহের কারণে হুদুদ বা নির্ধারিত শাস্তিগুলো রহিত হয়ে যায়।)

যুক্তি ও বিশ্লেষণ (الاستدلال والتحليل):

১. সন্দেহের উপস্থিতি: খবরে ওয়াহেদ (একক বর্ণনাকারীর হাদিস) 'জন্নী' (ধারণাপ্রসূত)। অর্থাৎ, এতে ভুলের সামান্যতম সম্ভাবনাও থাকে। আর হুদুদ বা মৃত্যুদণ্ড/অঙ্গহানির মতো শাস্তির জন্য ১০০% নিশ্চিত প্রমাণ (ইয়াকিন) প্রয়োজন।

২. সতর্কতা: ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, যেখানে সামান্য সন্দেহ (শুবহা) থাকে, সেখানে হুদুদ প্রয়োগ করলে অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই খবরে ওয়াহেদ দিয়ে সর্বোচ্চ 'তাযির' (লঘু শাস্তি বা সতর্কীকরণ) দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু 'হদ' জারি করা যাবে না।

উদাহরণ (المثال):

মদ্যপানের শাস্তি (৮০ দোররা) এবং চুরির শাস্তি (হাত কাটা)—এগুলো প্রমাণের জন্য কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদিস অথবা দুই জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর চাক্ষুষ সাক্ষ্য লাগবে। কেবল একজন বর্ণনাকারীর হাদিসের ওপর ভিত্তি করে কোনো নতুন 'হদ' বা শাস্তি চালু করা যাবে না যা কুরআনে নেই।

উপসংহার:

ইমাম কারখীর এই নীতি ন্যায়বিচারের রক্ষাকবচ। অপরাধী যেন সন্দেহের সুবিধা পায় এবং নিরপরাধ ব্যক্তি যেন ভুল সাক্ষ্য বা দুর্বল প্রমাণের কারণে কঠোর শাস্তির শিকার না হয়, সে জন্যই খবরে ওয়াহেদকে হুদুদের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।